অটলকে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রূপ করে, কিন্তু তার প্রতি সমবেদনার জন্যে স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতেও বলে; কাঞ্চনকে বিদ্রূপ করে, কিন্তু তাকে অসম্মান করে না। ফলে তার বিদ্রূপগুলি মাত্রাসংযুক্ত এবং সেই কারণেই সহনীয়।

অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গির তত্ত্ব অর্থাৎ kinesics-এর দিক থেকে বিচার করলে, প্রহসনের কিছু গুণধর্ম রচনাটিতে মেলে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই : নিমচাঁদের 'ভঙ্গির সহিত জাবর কাটন' (১।১), অটলের হাতে শ্যাম্পেন দিয়ে পান করতে অনুরোধ (ঐ), কাঞ্চনকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে 'করযোড় পূর্বক স্তুতি' (ঐ), অটলের 'জিব কাটা' (১।২), ভোলাচাঁদ, কেনারাম ও রামমাণিক্য প্রত্যেকের ভাবভঙ্গি, বোতলের কানায় নিমচাঁদের মদ্যপান (২।২), অটল কর্তৃক রামমাণিক্যের 'মুখের আঘ্রাণ গ্রহণ' (ঐ), রামমাণিক্যের পূর্ববঙ্গীয় ভাষার উচ্চারণ, এবং তার 'মাতাল হইয়া পপাত ধরণীতলে' (২।৩), 'দামা কর্তৃক রামমাণিক্যের অচৈতন্য দেহ' টেনে নিয়ে যাওয়া (ঐ), অটলকে নিমচাঁদের 'বারম্বার মুখব্যাদান করিয়া ভঙ্গি দর্শায়ন' (ঐ), নিমচাঁদ কর্তৃক অযোধ্যা সিং-এর 'ঘাড় ধরিয়া মুখ চুম্বন' এবং অযোধ্যা সিংয়ের 'নিমচাঁদকে রাস্তায় চিত করিয়া ফেলন' (২।৩), হনুমানজ্ঞানে বৈদিককে নিমচাঁদের 'আলিঙ্গন' এবং তার 'গালে কামড়ায়ন' (ঐ), নিমচাঁদের 'অঙ্গুলি বেষ্টন করিয়া জিহ্বা ধারণ' (৩।১), বোতলকে প্রেয়সী বলা, রামমাণিক্যকে 'গলা ধরিয়া প্রহার' (ঐ), অটলের 'দেয়ালে মাতাকুটন' (৩।২), 'কামিজ ছিঁড়িয়া আপনার বক্ষে চপেটাঘাত' (ঐ), 'অটলের দাড়ি ধরিয়া নিমচাঁদের গান' (ঐ), এবং অটলের 'পদাঘাতে নিম্নে দন্তের দূরে পতন' (ঐ), রামধনের প্রহারের কালে নিমচাঁদের উক্তি (৩।৩), প্রভৃতি। এগুলির সবগুলির মধ্যেই কিছু Kinesics-এর উদাহরণ নেই; কয়েকটি নিতান্তই দৈহিক Action। সেগুলিও প্রহসনের পক্ষে উপযোগী। প্রতিভাবান অভিনেতার কাছে প্রহসনরূপ নাটকটির অভিনয়ের আরো অনেক সুযোগ আছে।

দীর্ঘ আলোচনার শেষে এইবার আমাদের সিদ্ধান্তের কথা বলি। ভিন্ন প্রকার মতামত সত্ত্বেও নাটকটির রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'Bengali Literature' ('ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকা, ১৮৭১) প্রবন্ধে এটিকে 'farce' বা 'প্রহসন' আখ্যা দিয়েছিলেন। তেমনি, ওই বছরেই ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'নাটক ও নাটকের অভিনয়' ('এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত) প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, "...যদিও ইহার প্রহসন নাম দেওয়া আছে; তথাপি আমরা ইহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া ইহাকে নাটক বলিয়াই জ্ঞান করি।" অতঃপর উৎসাহের আধিক্যে তিনি রচনাটিকে একবার 'কাব্য' পর্যন্ত বলে ফেলেছেন।

আমরা দেখিয়েছি, গিরিশচন্দ্র রচনাটিকে 'সমাজচিত্র' আখ্যা দিয়ে এটির ওপর সুবিচার করেননি। নিমচাঁদ চরিত্র ট্র্যাজিক হয়ে ওঠেনি। তবে তার কারুণ্য-বিষাদ-নৈরাশ্য স্বীকার্য। সেটাই আবার রচনাটিকে কমেডি হতে গভীরভাবে সাহায্য করেছে। রচনাটি যে কমেডি আমরা তা স্বীকার করেছি; তবে কেবল নিমচাঁদ চরিত্রের জন্যেই নয়, আরো চারটি দিক থেকে। কাজেই যাঁরা কেবল নিমচাঁদের চরিত্রের বিশেষত্বের জন্যেই কমেডি বলতে চান, আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য প্রহসনের বদলে 'নাটক' বলতে চেয়েছেন, তা হয়তো 'রেগুলার ড্রামা'—কিন্তু 'কমেডি' কিনা বলা নেই, উপরন্তু 'কাব্য' এই আখ্যায় তা রহস্যই থেকে গেছে। 'কমেডি' বলবার পরও কেন আমরা 'প্রহসন' বলতে চেয়েছি? ড. ভবানীগোপাল সান্যালও তো তাই বলেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিকোণের তফাত এই : ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর কাছে কমেডি ও প্রহসনের মধ্যে ভেদবোধ তেমন না থাকায় রচনার ও আস্বাদনেও তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রহসনকে কোনো নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক বলে মনে করা হয়নি বলেই তা ঘটেছে। এইজন্যে প্রহসনের সবকটি লক্ষণ এতে পাইনি; তেমনি, একই নিমচাঁদের মধ্যে কমেডি ও প্রহসন—দ'য়েরই উপকরণ দেখেছি, যে নিমচাঁদ আবার অটলেরই পরিপূরক চরিত্র।।

Scanned with CamScanner

... ৫ ...

**।। সধবার একাদশী : প্রহসন, 'সমাজচিত্র', কমেডি, ট্রাজেডি।।**

'সধবার একাদশী'র প্রথম সংস্করণ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। এই জন্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পদনায় যে 'দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়েছে, তাতে প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র দেওয়া যায় নি। এর ফলে আখ্যাপত্রে রচনাটি লেখক-কর্তৃক কি নামে অভিহিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। আজ তাই প্রশ্ন উঠেছে, 'সধবার একাদশী' কোন ধরনের রচনা,—একি প্রহসন, না 'সমাজচিত্র', না কমেডি, ইত্যাদি। আখ্যাপত্র যেমন পাওয়া যায় নি, তেমনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ঠিক কোন্ তারিখে গ্রন্থটি প্রকাশিত, তাও আজ অনুমানের বিষয়। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত (ভূমিকা : দীনবন্ধু রচনাবলী। মে, ১৯৬৭) এই জন্যে একটি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন : ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর 'বেঙ্গলী' পত্রে 'সধবার একাদশী'র সমালোচনা বের হয়, এর থেকে তিনি অনুমান করেন, গ্রন্থটি ওই তারিখের কিছু আগে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাঙলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. সুকুমার সেন মশাই অবশ্য উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার করে গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন এই বলে : "সধবার একাদশী প্রহসন—"। তিনি প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র থেকে যদি এই বিশেষণ গ্রহণ করে থাকেন, তবে তাঁর প্রদত্ত তথ্যকেই প্রামাণ্য বলে মানতে হবে। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র না দেখলে অবশ্য সে কথা উঠছে না।

আখ্যাপত্র নিয়ে যত অনিশ্চয়তাই থাকুক, গ্রন্থটি যে রচনাকাল থেকে 'প্রহসন' হিসেবেই আস্বাদিত ও অভিনীত হয়ে আসছে, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু যাঁরাই রচনাটির অভিনয়ের উদ্যোক্তা তাঁরাই যদি এটিকে ভিন্ন নামে চিহ্নিত করতে চান তখন প্রশ্নটি নতুন করে উঠে পড়ে।

যেমন, গিরিশচন্দ্র। তিনি তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকটি দীনবন্ধুর নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পৃষ্ঠাতে দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভার খতিয়ান করতে গিয়ে 'সধবার একাদশী'কে 'সমাজচিত্র' আখ্যা দেন।[১] আমাদের প্রশ্ন এখানেই : প্রহসন না বলে 'সমাজচিত্র' বললেন কেন? 'সমাজচিত্র' কি প্রহসনের সমনাম (synyncme), না কি সাহিত্যের প্রকৃতির বিচারে 'প্রহসন' থেকে ভিন্ন কোনো শ্রেণীর রচনা?

ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর কাছে 'প্রহসন' অভিধাটি কোন্ অর্থে গৃহীত হত, ভাগ্যক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মশাই তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (চতুর্থ সং ১৯২৫। পৃ. ২৩৩) গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন : "সমাজ প্রচলিত কোন দোষের সুবিস্তার বর্ণন, সেই দোষের জন্য অনিষ্ট সংঘটন ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণনা করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই বোধ হয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

প্রহসনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রামগতির সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মতের পুরোপুরিই মিল থাকবে, এমন কোনো কথা নেই। তবু তাঁরা সমকালের বাঙালী, মতের মিল থাকা আশ্চর্যের নয়। সেই দিক থেকে বিচার করলে 'প্রহসন' ও 'সমাজচিত্র'—এই দুই অভিধার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, দুইই সমপরিমাণে দেখা যায়। লক্ষ করতে হয়, 'সমাজ'-এর প্রসঙ্গটি দু'জনেই লক্ষ করেছেন : কিন্তু রামগতি যে 'পরিহাস ও ঘৃণা উৎপাদনে'র উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করেছেন, 'সমাজচিত্র' অভিধার পরিধির মধ্যে তা ধরা পড়ে না। অথচ, গিরিশচন্দ্র প্রহসন এবং প্রহসনতুল্য রচনার মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলেন। তাই কখনো 'পঞ্চরং' (ড. সুকুমার সেন 'পঞ্চরং'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই : 'বিদ্রূপাত্মক প্রহসন'। টীকাটি লক্ষণীয়), কখনো 'সামাজিক নকসা' অভিধা প্রদান করে প্রহসনের সঙ্গে এ ধরনের

---

১. গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' নামের গদ্য রচনার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং দীনবন্ধুর নাটকের কলাকৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

রচনার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যিনি এবিষয়ে এতখানি সচেতন, তিনিই যেহেতু এই 'সমাজচিত্র' আখ্যা প্রদান করেছেন, সেহেতু ব্যাপারটি আমাদেরও ভেবে দেখা প্রয়োজন।

'সধবার একাদশী' নাটকে সমসাময়িক কালের শিক্ষিত যুবক এবং ধনীর আদরে লালিত বিপথগামী সন্তানদের প্রকৃতি ও পরিণাম চিত্রিত হয়েছে—গিরিশচন্দ্র সেই অর্থেই সমাজ-দর্পণ রূপে নাটকটিকে গ্রহণ করে 'সমাজচিত্র' আখ্যা দিয়েছিলেন,—একথা বোঝা কারো পক্ষেই কিছুমাত্র কঠিন নয়। কিন্তু এই সহজ ও স্পষ্ট অর্থের পেছনে আরো কিছু দুর্লক্ষ্য কারণ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। ছিল বলেই মনে হয়। 'সমাজচিত্র' যেন গিরিশচন্দ্রেই স্ব-কথিত 'সামাজিক নক্সা'র অনুরূপ। গিরিশচন্দ্র নিজেও তাঁর একাধিক সামাজিক নাটকে তৎকালীন কলকাতার সমস্যাদির রূপ দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নাটক, 'সামাজিক নক্সা' নয়। 'সধবার একাদশী'র মধ্যে কোনো পরিপাটি কাহিনী নেই, ঘটনাগুলিকে বাহ্যত বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, এমন কি, কোনো-কোনো চরিত্রের অবতারণার সার্থকতা পর্যন্ত সংশয়ে আচ্ছন্ন—মনে হয়, 'সমাজচিত্র' আখ্যা-দানের মধ্যে গিরিশচন্দ্র নাটকের গঠনগত এই দিকের প্রতিই অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন। দ্বিতীয়ত, অনেকেরই ধারণা, অটল-নিমচাঁদ প্রচণ্ড প্রহারের পরও যে মদ খেতে বাগানে গেল, তার অর্থ—দু'জনের চরিত্রের কোনো সংশোধন প্রদর্শন করা হল না।[১] রামগতির মত যদি সেকালের বাঙালীর সাধারণ মত হয়, তাহলে 'প্রহসন' হতে গেলে দোষ দেখিয়ে চরিত্রের সংশোধন করতে হয়—'সধবার একাদশী'তে যা দেখানো হয়নি; অতএব তা 'প্রহসন' পদবাচ্য হতে পারে না, 'সমাজচিত্র' হতে পারে মাত্র! এই আখ্যাদানের মধ্যে তাই নির্বিশেষভাবে সেকালের এবং বিশেষভাবে গিরিশচন্দ্রের মানস বিম্বিত হয়েছে। 'প্রহসন' সম্পর্কে তৎকালীন বাঙালীর অন্য ধারণার কথা পরে বলছি।

বিশিষ্ট নাট্য-সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষ মশাই তাঁর 'বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস' (প্রথম সংস্করণ ১৯৪৬। পৃ. ৬০) বইতে 'সধবার একাদশী'কে 'বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসন' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মতের পরিবর্তন ও সংশোধন করেন। 'দীনবন্ধু রচনাবলী' (জুলাই, ১৯৭৪। পৃ. ৩৪)-র সম্পাদকরূপে তিনি রচনাটিকে 'উচ্চাঙ্গের কমেডি' বলেছেন। কমেডির সঙ্গে প্রহসনের পার্থক্য প্রদর্শন করে রচনাটির মধ্যে কমেডির লক্ষণ কতখানি আছে, তা দেখিয়েছেন। ড. শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল মশাই তাঁর 'দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য সমীক্ষা' (সেপ্টেম্বর, ১৯৮০। পৃ. ১৫৬) বইতে প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করলেও ঈষৎ ভিন্নতাও প্রদর্শন করেছেন : '...দীনবন্ধু নিমচাঁদকে কেন্দ্র করে অঙ্কিত করেছেন কমেডি। তবুও তাঁর নাটক প্রহসনের ধর্ম থেকে একেবারে মুক্ত নয়।' অর্থাৎ ড. সান্যালের মতে রচনাটি খানিক কমেডি (নিমচাঁদের চরিত্রের বিশেষত্বের দিক থেকে), খানিক প্রহসন (রচনাটির অন্যান্য দিককে অবলম্বন করলে)।

ড. অজিতকুমার ঘোষ তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থের সম্পাদকীয় মন্তব্যে পুনরায় বলেছেন : 'নিমচাঁদ চরিত্রে কমেডি ও ট্র্যাজেডি যেন মিলে মিশে আছে। তার কথা ও আচরণে কমেডির উপাদান। কিন্তু তার নিভৃত আত্মানুভূতি এবং আত্মগ্লানিপূর্ণ স্বগতোক্তিতে ট্র্যাজেডির উপকরণ বর্তমান' (পৃ. ৩৫)। তা হলে, দু'জন সমালোচকের মন্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে আমাদের প্রশ্নটা দাঁড়াল এই : 'সধবার একাদশী' কতখানি কমেডির সঙ্গে ট্র্যাজেডি; কতখানি প্রহসনের সঙ্গে কমেডি। দু'জনেই একটির সঙ্গে অপরটির মিশ্রণ লক্ষ করেছেন।

কমেডিকে মাঝখানে রেখেই দু'জন সমালোচক গ্রন্থটির স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। মনে হয় দু'জনেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবিত। 'পঞ্চভূতে'র 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধে ক্ষিতি বলেছেন :

---

১. আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, পরিবর্তন এসেছে, তবে তা সূক্ষ্মভাবে। কাহিনী-বিন্যাসেও গভীর ঐক্য ও ব্যঞ্জনার বোধ আছে।

Scanned with CamScanner

'কমেডির হাস্য এবং ট্র্যাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে—'। ব্যোম তৎক্ষণাৎ তাঁকে সমর্থন করে বলেছেন, সেই মাত্রার তারতম্য দিয়েই তিনি কোনটি প্রহসন কোনটি ট্র্যাজেডি, তা বলে দিতে পারেন। এখানে লক্ষণীয়, একদিকে আছে প্রহসন-কমেডি, আর একদিকে ট্র্যাজেডি, দুয়ের মধ্যে তফাত কেবল মাত্রার। একই কথা 'কৌতুক-হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধেও মেলে।

কিন্তু তবু দু'জনের মধ্যে পার্থক্যও আছে। ড. ঘোষ একই নিমচাঁদের মধ্যে কমেডি ও ট্রাজেডিকে দেখেছেন। অর্থাৎ তিনি একই চরিত্রের মাত্রাগত পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। ড. সান্যাল সেখানে নিমচাঁদের মধ্যে কমেডিকেই কেবল দেখেছেন, ট্র্যাজেডি নয়। আমরা মনে করি, কমেডির মাত্রা বাড়ালে যেমন ট্র্যাজেডি হয়, তেমনি মাত্রা কমালে তা প্রহসনে পরিণত হয়ে যায়।

এই মাত্রাগত দিকটিকে মনে রেখেও কিন্তু আর একটি কথাও বিবেচ্য। কমেডি ও ট্র্যাজেডির মধ্যে জীবনের একটি তত্ত্ব আছে, প্রহসনে যা নেই। অর্থাৎ প্রহসনের মাত্রা ডবল করে দিলেই তা ট্র্যাজেডি হয়ে উঠবে না। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর সেই চিন্তা ছিল কিনা সন্দেহ। আজ আমরা প্রহসনকে যে খাঁটি ও কুলীন নাট্যধারা থেকে চ্যুত অক অকুলীন সাহিত্য বলতে অভ্যস্ত, গেল শতকের বাঙালী কিন্তু তা মনে করত না। প্রহসন অনেকখানিই সেদিন কমেডির সমনাম ছিল, প্রহসনের কৌলিন্য সম্পর্কেও সংশয় ছিল না, এই জন্যেই ব্যোম প্রহসনকে কমেডির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। শ্রেষ্ঠ বাঙালী নাট্যকারগণও 'প্রহসন' রচনাকে প্রতিভার হীনতা বলে মনে করেন নি। তার কারণ প্রহসন সেদিন জাতীয়-জীবনে একাধারে আহার ও ঔষধ দুই-ই ছিল; তাতে পরিহাসের আহার এবং সংশোধনের ঔষধ দুই-ই থাকাতে রেনেসাঁসের বাঙালীর মানসিকতাকে তা স্পর্শ করতে পেরেছিল। সাহিত্যের শ্রেণীভেদ নিয়েও সেদিন শ্রেষ্ঠ বাঙালীরও তেমন মাথা-ব্যথা ছিল না। তার প্রমাণ 'প্রবন্ধ' অভিধা সম্পর্কে শিথিলতা। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে' এমন-এমন রচনা দিয়েছেন—যা খাঁটি অর্থে 'প্রবন্ধ' নয়, সৃষ্টিমূলক সাহিত্য এবং 'বিবিধ প্রবন্ধে' রবীন্দ্রনাথ সব কটিই সৃষ্টিমূলক রচনা দিয়েছেন। 'প্রবন্ধ' সম্পর্কে যেমন, 'প্রহসন' সম্পর্কেও তেমনি। 'সধবার একাদশী' কতখানি 'প্রহসন' বা 'কমেডি', সে বিচার করবার সময় তাই গত শতকের বাঙালী-মানসের চিন্তাটিকে অনুধাবন করে নিতে হবে।

এ পর্যন্ত সমস্যাটিকে লক্ষ করা গেল। এইবার জিজ্ঞাস্য, আমরা রচনাটিকে কোন্ নামে চিহ্নিত করব? এবার সে প্রসঙ্গেই আসি।

দেখা যাচ্ছে, নিমচাঁদ চরিত্রটির সম্পর্কে ধারণার অস্থিরতাই নাটকটির গোত্রের ভিন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অটল ও নিমচাঁদকে ভিন্ন দুই চরিত্ররূপে সকলকেই গ্রহণ করেছেন। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখিয়েছি, ভিন্নতা সত্ত্বেও এ দুটি চরিত্র পরস্পরের প্রসারিত রূপ, জুটি চরিত্র। ভিন্নতা সত্ত্বেও এ দুটি চরিত্রকে অভিন্ন চরিত্র বলে মনে করলে নিমচাঁদ চরিত্রের নবতর মাত্রা উদ্ঘাটিত হয় এবং ফলে নিমচাঁদ চরিত্রের সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয়ত, নিমচাঁদ চরিত্র আদৌ ট্র্যাজিক কি না, সে বিচার।

নিমচাঁদের কান্না-বেদনা-গ্লানি-অধঃপতনে আমাদের মনে করুণা-সমবেদনা জাগ্রত হয় ঠিকই, কিন্তু তাকে ট্র্যাজিক বলা যায় না। নাটকের মধ্যে নিমচাঁদ বরাবর মাতাল, এমন কি অটলকে মদ ধরিয়ে নিজের মাতাল-যাত্রা নির্বাহের পরিকল্পনায় (এইখানে ওথেলোর দাম্পত্য-জীবনের বিরুদ্ধে ইয়াগোর ষড়যন্ত্রের ভাষা ব্যবহার করেছে সে) রত। তার উন্নত ও উত্থিত রূপ বারেকের জন্যেও যেখানে নাটকে বর্ণিত নেই, সেখানে তার 'পতন' বলে কিছু থাকতেই পারে না, কারণ, প্রথমাবধিই সে 'পতিত'। আবার, যদি এমন দেখা যেত, নিমচাঁদ আত্মশোধনের চেষ্টা করেছে, কিন্তু নিয়তি বা অদৃশ্য কোন দুর্বার শক্তি তাকে সে পথে পরিবর্তিত হতে দিচ্ছে না, তবে অসহায়ত্বজনিত এক ধরনের ট্র্যাজেডি তার মধ্যে আসতে পারত। সবচেয়ে বড়ো কথা, নিমচাঁদ আশাবাদী,—আশাবাদী চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা অনেকটাই দূরীভূত হয়ে যায়। 'ম্যাকবেথ' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে তার উক্তিতে

Scanned with CamScanner

('Things at the worst will cease...') চরম আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নানা কারণে নিমচাঁদের মধ্যে হতাশা এসেছিল (বঙ্কিমচন্দ্র তার উল্লেখ করেছেন); কারণগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক। এই কারণগুলিই যদি নিয়তি বা অন্য কোনো অদৃশ্য বা দৃশ্য অপরাজেয় এক শক্তিরূপে নাটকে দেখা দিত, যার প্রভাবে ব্যক্তির শক্তি ও প্রতিভার অপচয় ও অবক্ষয় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত, তবে নিমচাঁদের মধ্যে একটি যুগের তাবৎ মানুষের ট্র্যাজেডি আসতে পারত। তাছাড়া যেখানে নিমচাঁদ নিজেই নিজের অধঃপতন সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন (যে সচেতনতা ওথেলোর মধ্যে নেই। তাঁর মতো একজন উচ্চপদস্থ সেনাপতির পক্ষে তাঁরই অধঃস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ডেসডিমোনার সতীত্ব নিয়ে আলোচনা করাটাই যে তাঁর বড়ো নৈতিক অধঃপতন, ওথেলো তা বুঝতে পারছেন না, পাঠক-দর্শক বুঝতে পারছেন) এবং কেবলমাত্র নিজের সহজ, স্বাভাবিক ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যেই যেখানে মদ্যপানের দোষ থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে, সেখানে স্বাভাবিক কারণেই ট্র্যাজেডির বীজ বিনষ্ট হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকেও অপরিমিত মদ্যপানের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু সেখানে মদ্যপান-প্রবণতা একটি বিশেষ অনতিক্রম্য, প্রায় নিয়তির মতো দুর্বার ও দুরধিগম্য শক্তিরূপে প্রদর্শিত। সেখানে মানুষ মদ খায় না, মদই মানুষকে খায় (যাকে বলে Dipsomania), এবং মদ না খেয়ে মানুষের যেন কোন উপায় নেই, এই ভাবটি ফুটে উঠেছে—নিমচাঁদের মধ্যে যা দেখি না। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নিমচাঁদ বলেছে; 'মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই?' এই উক্তির মধ্যে মদের প্রতি যে অসহায় আত্মসমর্পণ আছে, তাতে নিয়তির একটি অস্পষ্ট অভিভব লক্ষ করা যায় বটে, কিন্তু প্রসঙ্গটি নিমচাঁদ-চরিত্রে আর একটু বিস্তৃত ও স্পষ্টতার হলে ট্র্যাজেডির একটি সম্ভাবনা সৃষ্ট হত। যা হোক, এরপর অটলকে যদি নিমচাঁদের পরিপূরক চরিত্ররূপে গ্রহণ করি, তবে ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা আরো সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

কিন্তু ট্র্যাজিক চরিত্র না হলেও নিমচাঁদের অন্তর্নিহিত কারুণ্য ও বিষাদকে মানতেই হয়। সেই কারুণ্য ও বিষাদ উপযুক্ত কারণে ট্র্যাজেডির মাত্রাস্তরকে স্পর্শ করতে পারে নি, কিন্তু কমেডিকে পূর্ণতা দান করেছে। সকলেরই জানা আছে, খাঁটি ও গভীর রসের কমেডির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন হাসিই কেবল থাকে না, অন্তর্লীন একটি গোপন অশ্রুধারাও অদৃশ্যভাবে সেখানে কাজ করে যায়। অটলের উদ্দাম ক্রিয়াকলাপ, পরস্ত্রী অপহরণের কালে ভুল করে ঠিক কাজ করা, চমৎকার comedy of error। কেবল নিমচাঁদের মধ্যেই কিছু কমেডি, কিছু ট্র্যাজেডিকে দেখতে গেলে দৃষ্টি খণ্ডিত হবে, পূর্ণ গ্রন্থটিকে দেখা হবে না। নিমচাঁদ ও অটলকে মিলিয়ে নিয়েই গ্রন্থটির সাহিত্যিক গোত্র নিরূপণ করতে হবে।

এইবার বিচার্য, নিমচাঁদ-অটলের মধ্যে কমেডির উপকরণ কতখানি। বাঙালী নাট্যকার ও সমালোচকদের নাট্যরুচি প্রধানত শেক্সপীয়র-ভিত্তিক। সুতরাং শেক্সপীয়রীয় আদর্শেই গ্রন্থটির কমেডিত্ব বিচার করা সঙ্গত হবে।

কমেডি ও প্রহসনের মধ্যে কেবল মাত্রারই তারতম্য নেই, জীবনদৃষ্টিরও তফাত আছে। কমেডির পেছনেও একটি জীবনতত্ত্ব থাকা চাই। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায়, 'সধবার একাদশী'র নাট্যব্যঞ্জনা নিয়ে আলোচনাকালে দেখিয়েছি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নিয়ে জীবনের একটি পূরপূর্ণতাকে এই রচনায় তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং আমাদের মতে কমেডির যে প্রথম শর্ত—একটি বিশিষ্ট জীবনতত্ত্ব বা জীবনদৃষ্টির উপস্থিতি—তা এইভাবে পূরণ করা হয়েছে।

কমেডির দ্বিতীয় শর্ত—চরিত্রের অসঙ্গতি প্রদর্শন, কিন্তু তা অতিরঞ্জিত না হয়ে বাস্তবতাধর্মী হবে। অর্থাৎ তা খুব সংযত মাত্রায় হবে। নিমচাঁদ একটি কমিক চরিত্র, কিন্তু সর্বদা বা সর্বথা নয়। একদিকে মাতাল হয়েও সে সাহিত্যরসিক, চরম অবহেলিত হয়েও যে ঠিক-ঠিক মুহূর্তে ঠিক-ঠিক ভাবে শেক্সপীয়ার-মিল্টন মন্থন করে বাক্য উদ্ধৃত করতে পারে; সে যতো গভীরভাবে মাতাল, তত সূক্ষ্মভাবে সাহিত্যরসিক

Scanned with CamScanner

(ঠিক কমলাকান্তের মতো, আফিংয়ের নেশা যে দিন যত বেশি সেদিন চিন্তাশক্তি তত গভীর ও প্রখর) এটাই সবচেয়ে বড়ো অসঙ্গতি। সেই অসঙ্গতির সঙ্গে জুটেছে তার Ready wit, খর বাক্য, শানিত বাচনভঙ্গী। সাধারণ ক্ষেত্রে, আমরা প্রত্যাশা করি, মাতাল হলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যায়, নিমচাঁদের ক্ষেত্রে তার বিপরীত—এটিই এখানে অসঙ্গতি।[১] অপরদিকে আত্মসম্মানবোধ ও শিক্ষার অভিমান, বংশের আভিজাত্য ও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যহীনতার বিবেকদংশন, এগুলি তার সংযম ও সুস্থতার অর্থাৎ মাত্রাবোধের দিক। অপর চরিত্রাবলী যেখানে উদ্দাম, নিমচাঁদ সেখানে স্থিতধী। তার চরিত্রের কারুণ্য-বিষাদে ও মানবিকতায় সে প্রহসনধর্মী চরিত্রের মতো একটি বিশেষ যুগের মধ্যেই বন্দী নয়, কমেডির চরিত্রের মতো যুগকে অতিক্রম করতে সক্ষম—যেমন শেক্সপীয়ারের ফলস্টাফ, যুগকে ধারণ করেও যুগাতিশায়ী। তাকে ওপরে উল্লিখিত ভিন্ন দৃষ্টিতে উপস্থাপনার মধ্যে কমেডি-নাট্যকারের নিরাসক্তিও ব্যক্ত হয়েছে। নিরাসক্তির বদলে যদি আসক্তিই নাট্যকারের মধ্যে প্রবল হত, তাহলে নিমচাঁদকে ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদর্শন করা হত না, কেবল যে কোনো একটি দিকেরই প্রাবল্য ও অতিরঞ্জন থাকত। নির্লিপ্ত দৃষ্টির অধিকারী বলেই নাট্যকার তা করেননি। মনে হয়, এখানে শেক্সপীয়রীয় দৃষ্টিকোণ কার্যকরী হয়েছে। শেক্সপীয়ারের কমেডিতেও প্রধান চরিত্র স্থিতধী থাকে।

কমেডির তৃতীয় শর্ত—'টাইপ' চরিত্রের বিশেষ-বিশেষ ক্রিয়াকলাপ। বস্তুত, অনেকে এই 'টাইপ' চরিত্রকেই কমেডির একটি প্রধান দিক বলে মন করে থাকেন। এই 'টাইপ' চরিত্রগুলিই প্রধান চরিত্রদের চারপাশে একটি বিশেষ পরিমণ্ডল রচনা করে, হাসির একটি আবরণ নিক্ষেপ করে। আলোচ্য নাটকে অটল, কেনারাম, ভোলাচাঁদ, রামমাণিক্য প্রভৃতি সেই ভূমিকা পালন করেছে। শেষোক্ত চরিত্র তিনটির অবতারণার সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান; অতএব এদের দ্বারা সৃষ্ট হাস্যরসও অপ্রাসঙ্গিক বলে তাঁদের ধারণা। কিন্তু, দীনবন্ধু এই নাটকে একটি যুগকে উপস্থিত করেছেন; অটল বাবু কালচারের, কেনারাম মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর, ভোলাচাঁদ আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় অসম্পূর্ণ বাঙালীর, রামমাণিক্য পূর্ববঙ্গের প্রতিভূ। নাটকের প্রয়োজনেই এদের আগমন, সেই হিসেবে এদের ভূমিকা অকারণ নয়।

কমেডির চতুর্থ শর্ত—কাহিনী-বিন্যাসের বিশেষত্ব। প্রায় সব সমালোচকই 'সধবার একাদশী'র কাহিনীকে বিচ্ছিন্নতা-ধর্মী, অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন বলেছেন। আমরা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি। কমেডি 'রেগুলার ড্রামা'র পর্যায়ভুক্ত, প্রহসন তা নয়। 'রেগুলার ড্রামা' বা 'পূর্ণাঙ্গ নাটক' বলতে কিন্তু কেবল 'ফাইভ-অ্যাক্ট ড্রামা' বা 'পঞ্চসন্ধি নাটক'কেই বোঝাচ্ছি না। তিন অঙ্কেও 'পূর্ণাঙ্গ নাটক' হতে পারে। 'পূর্ণাঙ্গ নাটক' হল তাই, যাতে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের একটি বিস্তৃতিজাত পূর্ণতা ('বিস্তৃতি' কিন্তু কেবল নাটকের আকৃতিকেই বোঝায় না, প্রকৃতিকেও বোঝায়), বিশ্লেষণের গভীরতা, জটিলতার বৃত্তবৎ পূর্ণতা, বাহির-ভেতরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমন্বয়ের পূর্ণতা এবং সর্বোপরি জীবন সম্পর্কে একটি পূর্ণতার বোধ বা তত্ত্ব থাকে। এইসব পূর্ণতা আয়ত্তের জন্য নাটকের মধ্যে সর্বদাই আদি-মধ্য-অন্ত-সম্বলিত একটি পরিপাটি কাহিনী যে থাকতেই হবে, তার কোনো মানে নেই। নাট্যকার ইচ্ছে করলে বা তাঁর সে সামর্থ্য থাকলে (অধুনিক নাট্যকারেরা তাই করেন) কাহিনীর তথ্যগত নিটোল উপস্থাপন অপেক্ষা তার প্রতিক্রিয়াটুকুই কেবল গ্রহণ করেন। প্রহসনে এই ধরনের কোন পূর্ণতা সৃষ্টির দায়িত্ব নেই, তা সাধারণত খণ্ড বা ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায়, 'সধবার একাদশী'র কাহিনী-বিন্যাসের বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনাকালে দেখিয়েছি, এই নাটকের কাহিনী-বিন্যাসের মধ্যে নাট্যকার কতখানি সূক্ষ্মতা ও পূর্ণতার সৃষ্টি করেছেন। সে হিসেবে, নাটকটির কাহিনীকে কমেডির কাহিনী বলা যায়।

---

১. কেনারামের কথা ও কাজের অসঙ্গতিতে হাস্যরস এ কারণেই নেই—তা স্পষ্ট ও কঠোরভাবে নিমচাঁদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। ভোলাচাঁদের ইংরিজী বলবার প্রয়াসের সঙ্গে সাফল্যের অসঙ্গতি কিছু হাস্যরস সৃষ্টি করলেও তা উচ্চস্তরের নয়।

Scanned with CamScanner

ড. শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের পটভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক' (মার্চ ১৯৭৬) বইতে অধ্যাপক অ্যালারডাইস্ নিকলের (A. Nicoll : Theory of Drama, P. 224) সূত্র অনুযায়ী 'সধবার একাদশী'কে 'কমেডি অফ ম্যানার্স' বলেছেন। কেন না, 'Comedy of manners' হল মূলত intellectual নাটক, তাতে আবেগের কোনো বালাই থাকে না। এই ধরনের কমেডি 'appeals primarily and always to our reason. Its wit is purely intellectual; and appreciation of it comes from minds, not from the hearts' বৈদ্যনাথবাবু হয়তো নিমচাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ ও রসিকতাকে স্মরণ করেই এটিকে 'কমেডি অফ ম্যানার্স' বলেছেন। কিন্তু, প্রথমত, নিমচাঁদের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে আবেগও বর্তমান ছিল; দ্বিতীয়ত, কেবল নিমচাঁদকে দিয়েই সমগ্র নাটকের গোত্র বিচার যুক্তিযুক্ত নয়; এবং তৃতীয়, intellectualism-এর সঙ্গে-সঙ্গে নাটকটির কোনো- কোনো ক্ষেত্রে স্থূলতাও আছে। এই সব কারণেই এটিকে 'কমেডি অফ ম্যানার্স' না বলে 'নিছক কমেডি' বলাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে।

চারটি দিক থেকে আলোচনা করে দেখা গেল, 'সধবার একাদশী'কে কমেডি বলা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে নাটকটিকে কি 'প্রহসন'ও বলা যায়?—এবার, সবার শেষে, তাই-ই আলোচ্য।

সে বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমেই কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে : প্রথমত, প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্রে কথিত 'প্রহসন' আর 'বাঙলা প্রহসন' এক পদার্থ নয়। দুয়ের মধ্যে ঈষৎ যোগ আছেই, কিন্তু রূপ, ভাব, বিষয় ও প্রকাশ-কলার মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর। কাজেই প্রাচীন ভারতের নিরিখে তা বিচার্য নয়। দ্বিতীয়ত, এই পরিচ্ছেদেই, পূর্বে উল্লেখ করেছি, নবজন্মের ফলে প্রবুদ্ধ বাঙালীর মানসে 'প্রহসন' একটি জাতীয় ভূমিকা নিয়েছিল, তা একাধারে আহার ও ঔষধে পরিণত হয়েছিল। সেই জন্য প্রহসনকে হীনস্তরের সাহিত্য বলে তাঁদের কাছে মনে হয় নি। এই জন্যেই গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রহসনের খুব প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল। হয়তো অধিকাংশ রচনাই তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর ছিল, কিন্তু কিছু রচনার সাহিত্য-মূল্য ও ঐতিহাসিক-মূল্য কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এই প্রহসনের সঙ্গে সঙের একটি যোগ লক্ষ করেছেন ড. সুকুমার সেন, তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে। সঙ বাঙালীর জীবনের সঙ্গে বহুদিন থেকে জড়িত, প্রহসনের মধ্যেও সঙ স্থান করে নিয়েছিল। কোন-কোন ক্ষেত্রে প্রহসনের সমনামই ছিল 'সঙ'। বিশেষ-বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সঙ বের করা বাঙালীর এক বৈশিষ্ট্য; যথা, কালীপূজো, চৈত্রসংক্রান্তি, প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কাল্পনিক বা বাস্তবিক চরিত্রকে ব্যঙ্গ করে শোধন করবার জন্য সঙ বের করা হয়, ঠিক যেমন প্রহসনে চরিত্রের সংশোধন করা হয়। সঙের গায়ের বিচিত্র রঙ প্রহসনের অতিরঞ্জনের সঙ্গে তুলনীয়। সঙের সঙ্গে তৎকালীন 'নক্‌শা'-সাহিত্যের কথাও প্রহসনের প্রসঙ্গে ওঠে। আলোচ্য সময়ে বাঙলায় নক্‌শা-সাহিত্যের প্রাচুর্যও দেখা গেছে। নক্‌শার হাস্য, ব্যঙ্গ, সমাজধর্মিতা, প্রহসনের মধ্যেও দেখা যায়। সুতরাং, প্রহসন বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত,—একদিকে সঙ, অন্যদিকে নক্‌শার সঙ্গে যুক্ত থাকায় তা বাঙালীর জাতীয় মানসের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতে'র ব্যোম চরিত্রের মন্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, প্রহসন ও কমেডি বাঙালী মানসে অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এটি আগে উল্লেখ করেছি। 'প্রহসন' শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে যে 'হসন' কর্মটি প্রচ্ছন্ন আছে, বাঙালী সেই হাসির দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কমেডির সঙ্গে তাকে একাত্ম করে নিয়েছিল। এই জন্যে বাঙালীর কাছে কমেডি ও প্রহসন—দুই-ই আপন-আপন জাত খুইয়ে এক মিশ্র রসের তৃতীয় পদার্থে পরিণত হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা',—'প্রহসন' রূপে চিহ্নিত হলেও তাকে 'কমেডি' বলতেও বাধা নেই। ঠিক এই দৃষ্টি থেকেই

Scanned with CamScanner

'সধবার একাদশী'কে 'কমেডি' বলবার পর 'প্রহসন' বলতেও বাধা নেই। এই কারণেই দেখা যায় বাঙলায় দুজাতের প্রহসন লিখিত হয়েছে! এক জাতের প্রহসন যেন কমেডিরই নামান্তর, কমেডির সব লক্ষণ তাতে অল্পবিস্তর ধরা পড়ে। আর এক জাতের প্রহসনে সমকালীনতার উত্তাপ বড়ো বেশি, কাহিনী-বিন্যাসে বিক্ষিপ্ততা, পরিহাসের ঝাঁজ তীব্র, সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষা তার একটি বড়ো লক্ষ। অধিক কি, মাইকেলের দু'খানি প্রহসনকে সামনে রাখলেই এই দু'জাতের প্রহসনের প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা করা যাবে।' 'একেই কি বলে সভ্যতা?'র মধ্যে সমকালীনতা বড়ো বেশি; 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভক্তপ্রসাদেরা কিন্তু সমাজে চিরকাল বাস করে আসছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' সমসাময়িকতার কিছু প্রসঙ্গ থাকলেও (যেমন, ব্রাহ্মধর্ম ও স্ত্রী-স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করা) তাতে এবং 'তলীকবাবু'তে যে হাস্যরস আছে, তা এ যুগেও অচল নয়। বাঙলা প্রহসনে কখনো ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি কখনো চরিত্র। এই চরিত্র-প্রধান প্রহসনগুলিই কমেডির কাছাকাছি যেতে পেরেছে।

বিশেষভাবে এই কথাগুলি মনে রেখে, নির্বিশেষভাবে প্রহসনের বৈশিষ্ট্যগুলি এই ভাবে লক্ষ করা যায় : প্রথমত, 'প্রহসন' শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে যে 'অতিহাস্যে'র ব্যাপারটি আছে, তা সঙ্ঘটিত হয় কোনো সমসাময়িক ঘটনার (বা অন্যান্য ঘটনার) অতিরঞ্জিত রূপ এবং অতিরেক প্রদর্শন করে। প্রহসনে '২' এবং '২' মিলে '৪' না হয়ে '২২' হয়! দ্বিতীয়ত, এই অতিরেক বা অতিরঞ্জন যতোটা বাহ্য ঘটনার ও পরিস্থিতির বা তথ্যের, ততখানি চরিত্রের নয়। তৃতীয়ত, চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও বিবর্তন প্রদর্শিত হবে না। তবে সংশোধন থাকতে পারে। চতুর্থত, কাহিনী-বিন্যাসে পূর্ণতা থাকবে না, তা আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত হবে। পঞ্চমত, সমাজ-শোধনের আকাঙ্ক্ষা-উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে থাকলেও গভীর জীবনবাণীর অনুপস্থিতি দেখা যাবে। ষষ্ঠত, বিদ্রূপের (satire) সঙ্গে প্রহসনের কিছু যোগ-বিয়োগ দুই-ই আছে। স্যাটায়ারের মধ্যে থাকে কোন সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে সমাজের মত-মন্তব্য-সমালোচনা এবং কখনো প্রহসনের আধার গ্রহণ করে সেই মত মন্তব্য-সমালোচনাকে রুচি-রোচন করবার প্রয়াস। অন্যদিকে, প্রহসনের মধ্যে থাকে fun বা কৌতুককে ভিত্তি করে সমাজের সেই সব মত-মন্তব্য-সমালোচনাকে সহনীয়-গ্রহণীয় করবার প্রয়াস। স্যাটায়ারকে অবলম্বন করে সেই হাস্য-কৌতুকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো। অর্থাৎ স্যাটায়ার কিছু মাত্রায় প্রহসনকে এবং প্রহসন কিছু মাত্রায় স্যাটায়ারকে গ্রহণ করতে পারে। সপ্তমত, কমেডির সঙ্গে প্রহসনের একটি বড়ো তফাত হল, অভিনয়ের রীতির দিক থেকে। প্রহসনের অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ কমেডির তুলনায় সপ্রতিভ ও witty; এবং বিশেষ-বিশেষ পরিস্থিতির অভিনয়ে তাঁরা দৈহিক ও শারীরিক ভাবভঙ্গি দিয়ে হাস্যোদ্রেক করে থাকেন। এই জন্যে প্রহসনের আবেদন অনেকটাই দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কমেডির আবেদন সেখানে অনেকটাই বাচনভঙ্গির ওপরে এবং বুদ্ধির কাছে। ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন—সব ধরনের নাটকের অভিনয়ে বিশিষ্ট ভাব-ভঙ্গি ক্রিয়াশীল হয়। একে নৃতত্ত্বের পরিভাষায় বলা হয় 'Kinesics' অর্থাৎ 'Gesture Scholarship' অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গির বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা। প্রহসনের Kinesics বিশেষভাবে আলোচ্য একটি দিক।

প্রহসনের অন্যদিক সম্পর্কে পূর্বে উদ্ধৃত রামগতি ন্যায়রত্নের মন্তব্যটিও স্মরণ করা যেতে পারে। যাই হোক, এই নিরিখে 'সধবার একাদশী'কে কতখানি প্রহসন বলা চলবে, এবার তাই আলোচ্য।

'সধবার একাদশী'র বহুস্থানেই আতিশয্য-অতিরেক-অতিরঞ্জন ও উদ্ভট ভাব আছে। প্রারম্ভিক দৃশ্যেই নিমচাঁদের মদকে 'মহাত্মা' আখ্যা দিয়ে তার প্রশস্তি, 'পরিণয় নিবারিণী' সভা স্থাপনের উল্লেখ, কাঞ্চনের রূপগুরের ব্যজস্তুতিমূলক ছড়া—সবই এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তেমনি অটলের নির্লজ্জ উক্তি

Scanned with CamScanner

(পিতা ও গোকুলবাবুর কাছে), পরে গোকুলবাবুর স্ত্রীকে অপহরণের পরিকল্পনা; অটলের পিতামাতার ব্যক্তিত্বহীন অন্ধস্নেহের আতিশয্য; কেনারামের নির্বুদ্ধিতা ও ভণ্ডামি, ভোলার ভুল ইংরিজি; রামমাণিক্যের মূঢ়তা—সবই আতিশয্যমূলক। প্রেম-অভিমানেরও আতিশয্য দেখি, বারবধূ কাঞ্চনের জন্যে অটল যেখানে গলায় রুমালের ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। সেই গণিকার উদ্দেশে এক তুচ্ছ পদ্য রচনা করেছে বলে অটলকে নিমচাঁদ 'ইণ্ডিয়ান বাইরণ' বলতে চায়। 'Pierian' কে 'পিপে' 'Merchant of Venice'-কে 'Merchant of Venerials'. 'টিটোটলার'কে 'tatler' বলা—প্রভৃতি ভল ও বিকৃতিগুলোও লক্ষণীয়। সার্জেন্টকে শ্বশুর করতে চাওয়া, কিংবা নিমচাঁদের মুখে সে জন্যে বিয়ে-বাড়ির ছড়া আবৃত্তিও সত্যের (জেলখানা যেন বাসর-ঘর) অতিরঞ্জন। তেমনি ক্লিওপেট্রাকে 'জননী' বলা বা কাঞ্চনের কোলে অটলকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ-যশোদার কল্পনাও উদ্ভট, যদিও এর মধ্যে এক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আমরা লক্ষ করেছি। নিমচাঁদ-কর্তৃক কালীঘাটের কালীর সঙ্গে পুরীর জগন্নাথের 'amalgamate' হবার প্রস্তাবও উদ্ভট। কয়েকটি বাঙলা শব্দের উদ্ভট স্ত্রীলিঙ্গ-বিধানও (যেমন : বাবু-বাব্বী। ঘটিরাম-ঘটিরামিনী। সাধু-সাধুনী) ব্যাকরণ-বিভীষিকা রচনা করেছে। একই ব্যাপার ঘটেছে ইংরেজি ব্যাকরণ সম্পর্কে ("মাইয়াগোর 'শি, শিজ, শিম্' আইবে না ক্যান্?"), রামমাণিক্যের উক্তিতে। পিতার কাল্পনিক মৃত্যুতে, অটলকে সেই কাল্পনিক পিতা ভেবে, গঙ্গাজল বলে নিমচাঁদের মদ ছিটোনো (৩।২) মাতলামির এক অতিরঞ্জিত বিবৃতি। কিংবা দারোওয়ানের মুখচুম্বন।

এই অতিরেক-অতিরঞ্জনগুলি কিছু ঘটনাকে, কিছু চরিত্রকে অবলম্বন করে ব্যক্ত হয়েছে। খাঁটি প্রহসনে ঘটনারই অতিরঞ্জন থাকে, চরিত্রের নয়। তবে, চরিত্র যদি Extrovert হয় এবং অতিরঞ্জনগুলি চরিত্রের গভীর স্তরে গিয়ে না পৌঁছয়, তবে দোষের বলা যায় না। নিমচাঁদ ছাড়া এ নাটকের সব পুরুষ চরিত্রই Extrovert, সুতরাং চরিত্রের মাধ্যমে যে অতিরঞ্জনগুলি ঘটেছে, তাতে প্রহসনের ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরঞ্চ, বাঙলা প্রহসনে ঘটনা ও চরিত্রের মিশ্রণই দেখা যায়,—এতে বাঙলা প্রহসনের বিশেষত্বও তাই ফুটে উঠেছে।

প্রহসনের ধর্ম অনুযায়ী চরিত্রগুলিতে সাধারণ ও সহজবোধ্য দ্বন্দ্ব ও বিবর্তন নেই, তবে সূক্ষ্মভাবে সংশোধন আছে। নিমচাঁদের মনে যখন দংশন ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তখন সে বৃত্তিই প্রবল, বিপরীত বৃত্তির অস্তিত্বমাত্র সেখানে নেই। প্রথম দৃশ্যে যে নিমচাঁদ ইয়াগোর ভাষা ব্যবহার করে ইয়াগো-তুল্য হয়ে ওঠে, শেষে সেই নিমচাঁদই অটলকে গৃহে ফিরে যেতে বলে এবং পরস্ত্রী অপহরণ করতে নিষেধ করে। অটলও তেমনি পিতার পরামর্শ অনুসারে কাশী যেতে চায়, মদ্যপান যে কু-প্রথা তা বুঝতে পারে।

কিন্তু কাহিনী-বিন্যাসের দিক থেকে এ রচনাকে কিছুতেই প্রহসন-ধর্মী বলা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনী-বিন্যাসের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, অসংলগ্নতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা থাকলেও, সতর্ক দৃষ্টিতে বিচার করলে একটি গভীরতা, বিস্তৃতি ও ব্যঞ্জনাবোধের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় (এ বিষয়ে আমাদের পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। অটল নিমচাঁদকে পরস্পরের প্রসারিত ও পরিপূরক চরিত্ররূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং জন্ম-মৃত্যু-বিবাহকে কেন্দ্র করে একটি পরিপূর্ণ জীবনবোধ নাটকটির পশ্চাতে অলক্ষ্যে কাজ করে গেছে। শিল্পের দিক থেকে এই জন্যেই তা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবস্তু হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষত নাটকটি মদ্যপানের বিষময় ফল বর্ণনার নাটক হলেও লেখক সেই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে সাহিত্যের রসলোক নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উদ্দেশ্যটি প্রধান না হওয়ায় তাই কমেডির ভাব এসে গেছে এবং সে কারণেই এটিকে কেবল 'প্রহসন' বলেই ক্ষান্ত থাকা যায় না।

তবে, প্রহসনের রীতি অনুযায়ী কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের আভাস, এ নাটকে আছে। বিদ্রূপগুলি নিমচাঁদের উক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে। মূলত অটল, কাঞ্চন এবং কেনারামকে উদ্দেশ করে নিমচাঁদের বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছে। তৎকালীন শিক্ষা, কালচার, জীবন-ধারা, মধ্যবিত্তের মানস, অর্থনীতি—সবই এই বিদ্রূপের লক্ষ। কিন্তু সেই বিদ্রূপগুলি, প্রহসনের ধর্ম অনুযায়ী, সর্বদাই স্পষ্ট হয়ে অসহনীয় হয়নি। নিমচাঁদ

Scanned with CamScanner